সংকটের ভাষা : কবিকণ্ঠে

সুকুমার সিকদার

The means always affects the end,
it dignifies or distorts it

"তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান/করিলুঁ উদক পান/শিশু কাঁদে ওদনের তরে।" ঘনায়মান রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে বিপর্যস্ত সেকালের সাধারণ মানুষের বিপন্ন জীবনের আর্তি যে ভাবে এই কাব্যপক্তি দুটিতে ফুটে উঠেছে, তা দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করে রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতে নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের চিরকালীন দলিলে পরিণত হয়েছে। মধ্যযুগের কবি মুকুন্দরাম যেভাবে ব্যক্তিগত সংকট থেকে উত্তরণের তাগিদে নিজের এই দুর্দশার বর্ণনা করেছিলেন, একালের আধুনিক দৃষ্টিতে তাকে শুধু চিকিৎসকের কাছে মনোরোগীর আত্মউন্মোচন ভাবলে ভুল হবে, ব্যক্তিগত জীবনে যে ভয়ানক দিনগুলি কল্পনাতীত ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে কবি পার হয়ে এসেছেন, অনুভূতিপ্রবণ কবিমনের সেই অভিজ্ঞানের বিবরণ আধুনিক যুগের তাত্ত্বিকদের কাছে হয়তো হয়ে উঠবে 'art of atrocity'। কিংবা বিপরীতক্রমে আধুনিক কবি হানস মগনাস এনসেটসেনবার্গার যাকে বলেছেন 'surrender to cynicism', এই মনোবেদনার কথা প্রকাশ না করে নীরব থাকলে মধ্যযুগের কবি মুকুন্দরাম নিশ্চয়ই ভাবীকালের কাছে সেই একই দোষে অপরাধী সাব্যস্ত হতেন। এভাবেই আত্মিক তাগিদে যুগে যুগে কবি-সাহিত্যিকদের কলমে উৎপীড়কদের অত্যাচারের আখ্যান কাব্যরূপ পেয়েছে। নৃশংসতার ভাষা তাই আধুনিক আবিষ্কার নয় কোন মতেই।

রক্তের উল্লাস আদিম এবং জান্তব। এম্ফিথিয়েটারে বন্য শ্বাপদের হিংস্র নখদন্তে বিক্ষত হতভাগ্য গ্লাডিয়েটরের হৃৎপিন্ড রক্তচাপ দেখে সেকালের রোমের সম্ভ্রান্ত নাগরিকেরা উল্লাসে ফেটে পড়তেন। মৃত্যুযন্ত্রণার কাতর আর্তনাদ ঢাকা পড়ে যেত উন্মাদ নারী পুরুষের পাশবিক চীৎকারে। একালেও কিন্তু নিরীহ জনতার রক্তাক্ত পরিণামে উল্লসিত হতে দেখা যায় প্রাতঃস্মরণীয় নেতৃবর্গকে। বলশেভিকদের হাতে রাশিয়ার দক্ষিণের প্রদেশে অসংখ্য কুলাকের নিধনের খবর শুনে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির টুঁটি চেপে ধরার সাফল্যের আনন্দে উল্লসিত লেনিন সেদিন অট্টহাস্যে ফেটে পড়েছিলেন। তা শুনে বার্ট্রান্ড রাসেল লিখেছেন যে সেই আদিম হাসি শুনে তার রক্ত যেন জমাট বেঁধে গিয়েছিল উন্মাদের পৈশাচিকতায়। এর পরবর্তী অধ্যায়ে প্রায় সমগ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কালসীমা জুড়ে উন্মাদ আর্য রক্তের উন্মার্গগামীতার মূল্য চুকাতে ষাট লক্ষ নিরীহ ইহুদীকে 'Final Solution'-এর বলি হয়ে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে প্রাণ দিতে হয়েছিল। ইহুদীদের অন্যতম নিধন কেন্দ্র আউটসভিটসের গেটে প্রতারক উজ্জ্বল আলোয় বিভ্রান্তকরী বিজ্ঞাপন arbeit Macht Frei (শ্রমই দেয় মুক্তি) কুড়ি লক্ষ নিঃসংশয় নারীপুরুষকে গ্যাস - চেম্বারে স্বাগত করেছিল বর্বর হিটলারের নাৎসী বাহিনী। একইভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী ত্রিশ লক্ষ লোককে পাকিস্তানী ভুট্টোর কুচক্রে জঙ্গিশাসকদের বেয়নেট ও বুলেটের মুখে প্রায় দিতে হয়। ধর্ষিতা লাঞ্ছিতা হয়েছিলেন কয়েক লক্ষ নারী। এই দুই ক্ষেত্রেই সন্ত্রাস ছিল পূর্বপরিকল্পিত— সংগঠিত উন্মত্ত রাষ্ট্রীয় স্টীমরোলারের নিষ্পেষণ এখনও ইতিহাস হয়ে যায়নি।

আউটসভিটসের মৃত্যু শিবির থেকে আশ্চর্যজনকভাবে ফিরে এসে প্রাইমো লেভি পরিকল্পিত অমানুষিকতার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, এটা কি 'Logic intent of evil of the absence of logic?' লেভি প্রায় তেরো মাস সেই মৃত্যুপুরীতে বন্দী থেকে মুক্তি পাবার পরে তার আভ্যন্তরীণ তাড়নায় বন্দীজীবনের সেই পৈশাচিক অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখতে বাধ্য হন। লেখা শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেন তিনি অনুভব করেছিলেন— 'That agony returns/And till my ghastiy tale is told/This heart within me burns'. কিন্তু সেই লেখার কাজটি অতি সহজ ছিল না। তবুও ঐ লিখন জরুরী চিল। এই পৈশাচিক নারকীয়তা তো মুক্তবুদ্ধি মানুষের কল্পনা শক্তিকেও অসাড় করে দেয়। জর্জ স্টাইনারের মতে, 'The World of Auschwitz lies outside speech as it lies outside reason'। তবুও তিনি না লিখে পারেননি। ঐ লিখন জরুরী ছিল কেবলমাত্র মৃত্যুপুরীর গতানুগতিক ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। এটা তো কোন মর্মন্তুদ পৈশাচিক ঘটনাবলীর ধারাভাষ্য মাত্র নয়, এই লেখাই যে পরবর্তীকালের নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র যুদ্ধের সবচেয়ে বড় হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

সম্পূর্ণ আলাদাভাবে হলেও দীর্ঘকালের ব্যবধানে জীবন সম্পর্কে প্রায় একই মর্মন্তুদ উপলব্ধির বিবরণ দিয়েছেন ঔপন্যাসিক ডস্টয়ভস্কি (Notes from a dead House) ও আলেকজান্ডার সোলঝেনিটসিন (One day in the life of lian Denisovich) দিয়েছেন। গ্রন্থ দুটি উপন্যাস বলে পরিচিত হলেও শিল্পের শর্ত বজায় রেখে বন্দীশিবিরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যে এর উপজীব্য— একমাত্র দান্তের নরকের সাথেই বুঝি তার তুলনা হতে পারে। বাংলাদেশের ঘটনাবলী কিন্তু সেভাবে প্রকাশিত হয়নি সম্ভবত যোগ্য লেখনীর অভাবে। সেখানে মৃত্যুর ইতিহাস আছে, কিন্তু মৃত্যুপুরীর বীভৎস নারকীয়তার চিত্র কেউ আঁকেনি।

বাঙ্গালীর চৈতন্যপ্রবাহে একটি নৈর্ব্যক্তিক দার্শনিকতা সদা বিরাজ করে— জন্ম-মৃত্যু আবর্তিত হয় পূর্বশর্তানুসারে। আবার দেখা গেছে বাস্তবে কিন্তু সে নৈব্যক্তিক মানসিকতা খণ্ডিত ও দ্বিধাবিভক্ত। কার্ল মার্কসের মতই এক দলের বক্তব্য হল, "The more the opinions of the Author remains hidden, the better for the work of art". "যেখানে আমি সৃষ্টিকর্তা, সেখানে আমি একক, আমি মুক্ত, বাহিরের বহুতর ঘটনাপুঞ্জর দ্বারা জালবদ্ধ নই। ঐতিহাসিক পণ্ডিত আমার সেই কাব্যসৃষ্টির কেন্দ্র থেকে আমাকে টেনে এনে ফেলে যখন, আমার সেটা অসহ্য মনে হয়।" —'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা' (সাহিত্যের স্বরূপ) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যখন এই কথা লিখলেন, তখন মনে হতে পারে তিনি সমগ্রজীবন দেশকাল-সমাজ নিরপেক্ষ মহৎ সাহিত্য রচনাতেই নিবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাঁর 'গোরা', 'চোখের বালি' প্রভৃতি উপন্যাস কিংবা 'আফ্রিকা' 'সাধারণ

মেয়ে'র মতো কবিতার পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন যে কবি সমকাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকলে তাঁর কলমে 'পোহালে শর্বরী বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদন্ড রূপে'-র মত পংক্তি সৃষ্টি হত না। তবে একথাও ঠিক যে তাঁর পরবর্তী কবিরা যেমন সচেতনভাবে সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি-আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীকেও তাঁর কবিতার বিষয় করে নিয়েছেন, সে প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথে নেই। সমসাময়িকতা সেখানে অনুষঙ্গ মাত্র, অভীষ্ট নয়। এই কারণে রবীন্দ্রপরবর্তী কবিদের ক্ষেত্রে সমাজ-সচেতন অভিধাগুলি প্রযুক্ত হলেও রবীন্দ্রনাথকে কোন কালেই কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের ফ্রেমে ফেলে বিচার করার প্রয়োজন দেখা দেয় নি। রবীন্দ্রনাথ কালের মধ্যে থেকেও কালোত্তীর্ণ।

এখানেই রবীন্দ্রনাথের সাথে পরবর্তী কবিদের অনুভবগত পার্থক্য। তাঁরা প্রায়শ সমকালের ঘূর্ণাবর্তেই নিজেদের কাব্যতরী ভাসিয়েছেন। ভাবীকালের ভাবনা তাঁদের উদ্দীপ্ত করেনি বলে স্পষ্ট উচ্চারণে তাঁরা বলতে পারেন, 'পরোয়া করি না বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে' (আমার কৈফিয়ত)। অন্যতম কথাসাহিত্যিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রেক্ষাপট উন্মোচন করতে গিয়ে যা বলেছেন, এই প্রসঙ্গে তা অবশ্যই উল্লেখনীয়। 'ভদ্র পরিবারে জন্মে পেয়েছি তদনুরূপ হৃদয় আর মন অথচ ভদ্র জীবনের কৃত্রিমতা, যান্ত্রিক ভাবপ্রবণতা ইত্যাদি অনেক কিছুর বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে বিদ্রোহ মাথা তুলছে আমারই মধ্যে"। এর ফলে তাঁকে এই প্রশ্নটি ক্রমশ বিদ্ধ করতে থাকে যে তাঁর পঠিত সাহিত্য "ভদ্রজীবনের বিরোধ, ভন্ডামি, হীনতা, স্বার্থপরতা, অবিচার, অনাচার, বিকারগ্রস্ততা, সংস্কারপ্রিয়তা, যান্ত্রিকতা ইত্যাদি তুচ্ছ হয়ে এ মিথে কেন প্রশ্রয় পায় যে ভদ্রজীবন শুধু সুন্দর ও মহৎ...'? এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল লেখকের এই বৈপরীত্যের অন্তর্নিহিত সত্য আবিষ্কারের প্রচেষ্টা। লেখককে 'ক্রমে ক্রমে সাহিত্যের এই অসম্পূর্ণতা, বাস্তবজীবন ও সাধারাণ বাস্তব মানুষের অভাব বড়ই পীড়ন করত। সংঘাতের পীড়ন।" তিনি তাই বুঝতে পারলেন, "আমার নিজের জীবনের যে সংঘাত ক্রমে ক্রমে জোরালো হয়ে উঠেছিল, সাহিত্য নিয়ে ক্রমে অবিকল সেই সংঘাতের পাল্লায় পড়েছিলাম" (সাহিত্য করার আগে/ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

এই সমাজবীক্ষা ছাড়াও বাংলা কবিতার আধুনিক যুগের উত্থানপর্বে অবশ্যই ছিল বিশ্ব যুদ্ধোত্তর বিপর্যস্ত অস্তিত্ব ও বিপন্ন সময়। বঙ্গভঙ্গ পরিহার করা হলেও কলিকাতা থেকে রাজধানী দিল্লীতে অপসারণ, বঙ্গভঙ্গরোধের পরিণতিতে বাঙ্গালীমানসের ঐক্যে স্থায়ী চিড় ধরানো, রাশিয়ায় বলশেভিকদের উত্থান আশার আলোকে উদ্বেলিত যুবসমাজ, পৃথিবীর একদিকে ফ্যাসীবাদের আগ্রাসী মনোভাব, অন্য দিকে আন্তর্জাতিক বিশ্বাস তার বিরুদ্ধে সামুহিক প্রতিরোধের আগুন, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন প্রভাবশালী বাঙালী নেতৃত্বের অবসানান্তে রাজনৈতিক মঞ্চে গান্ধীজির পদার্পণ। একদিকে জালিয়ানওয়ালা বাগ, চৌরিচৌরা, অহিংস রাজনীতি, অন্যদিকে বাংলা - পাঞ্জাব-মহারাষ্ট্রের সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচেষ্টায় অস্থির, উত্তাপ, আলোড়িত তরুণ চিত্ত। এ যেন 'শিব ঠাকুরের আপন দেশে/ আইনকানুন সর্বনেশে।/ কেউ যদি যায় পিছলে পড়ে/ প্যায়দা এসে পাকড়ে ধরে।/ কাজির কাছে হয় বিচার/ একুশ টাকা দণ্ড তার"। এর পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, হিটলার, মুসোলিনী, আউটসভিটস, হিরোশিমা। এদেশে স্বাধীনতার জন্য নেতাজীর একক যুদ্ধপ্রচেষ্টা, নৌবিদ্রোহ, দুর্ভিক্ষ, কলিকাতা-নোয়াখালিতে দাঙ্গা-হত্যা-ধর্ষণ-লুঠ। এল স্বাধীনতা, দেশভাগের কলঙ্কিত ক্ষত নিয়ে, উচ্ছেদ, উদ্বাস্তু, আর একদফা রক্তপাত। পর পর কয়েকটি দশক এই নিয়ে বেড়ে উঠলেও শেষ কিন্তু এখানেই নয়। বামপন্থী আন্দোলন দানা বাঁধতেই তেভাগা, খাদ্য আন্দোলন। পরে কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন, চীন-ভারত যুদ্ধ, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, নকশালপন্থী আন্দোলন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, জরুরী অবস্থা। এই বাহ্যিক ঘটনাবলী ক্রমাগত বাঙালী চিত্তকে আলোড়িত করেছে বিগত কয়েকটি দশক ধরে। ধারাবাহিক ভাবে রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের এই ছিল প্রতিপাদ্য।

মার্কিন-রুশ ঠান্ডা যুদ্ধে দ্বিধাবিভক্ত পৃথিবীতে শেষ হয়ে গেল আরও একাধিক বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা। তবুও একটি শতাব্দীর প্রথমার্ধে দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধে মন্বন্তর দাঙ্গা দুঃখ ব্যতীত পৃথিবীর কোন লাভ না হলেও আখের গুছিয়ে নিল আমেরিকা। নাৎসী অত্যাচারে বিপর্যস্ত সমগ্র ইহুদী মেধা ইউরোপ থেকে নিরাপদ দূরত্ব মার্কিন মুলুকে আশ্রয় নিয়েছিল। শুধু ইহুদীরাই নন, সমগ্র পৃথিবীর মেধা সমাবেশ ঘটেছিল সেদেশে। ইউরোপের নতুন কিছু দেবার ছিল না। বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্য দুনিয়ার মধ্যমণি হয়ে উঠল সেই দেশ।

কিন্তু বাকী দুনিয়ার কোন লাভ হল কি? যুদ্ধে 'শবের সংসর্গ আর শিবার সদ্ভাব' বই মানুষের লাভ কিছু নেই, 'শূন্যে ঠেকেছে লাভে লোকসানে মিলে'। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত নিজে উপলব্ধি করেন এই অর্থহীন আস্ফালন মূঢ়তার নামান্তর, শুধু 'ভূষন্ডি কাক রক্তপঙ্ক খোঁটে'। অথচ

এরই আয়োজন অর্থশতক ধ'রে
দু-দুটো যুদ্ধ একাধিক বিপ্লবে;
কোটিকোটি শব পচে অগভীর গোরে,
মেদিনী মুখর একনায়কের স্তবে! (১৯৪৫)

এই অর্থহীন হিংসা ও বিপ্লবের নামে রক্তপাতের জন্য কবি আস্থা হারিয়ে ফেলেন সব কিছুর উপর। এই ধ্বংসের দ্বারা কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হবে? এই পরিস্থিতিতে বর্তমানেও নেই কোন আশার বাণী, 'মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ/ সংক্রমিত মড়কের কীট;/ শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ'। আর অতীতেও চলেছিল একই তান্ডব, ভবিষ্যতও তাই কোনো আশার আলো দেখাবে বলে ভরসা হয় না—

জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে

নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে। (যযাতি)

১৯৪২-এর দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের মৃত্যু হল। যে চাষী নিজের হাতে সোনালী ফসল ফলিয়ে এতকাল শহরের মুখে খাবার তুলে ধরেছিলেন, অসময়ের দুমুঠো অন্নের জন্য, একটু ফ্যানের জন্য এবার শহরের দ্বারস্থ তারা। কিন্তু সেই শহর নিষ্ঠুর, নির্দয়, অকৃতজ্ঞ— পড়েছে গ্রাম থেকে আসা আতঙ্কিত নরনারী—

নগরীর রাজপথে মোড়ে মোড়ে পড়ে আছে;
একটি মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে
তবুও আতঙ্কে হিম—হয়তো দ্বিতীয় কোন মরণের কাছে
(বিভিন্ন কোরাস/জীবনানন্দ)

ক্ষুধায় পীড়িত ও মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত এই নরনারী ও শিশুর ভয়ার্ত ছবি যেন ফুটে ওঠে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই কটি লাইনে—

শহরে এখন সন্ধ্যা নেমেছে তৃষিতের কথকতা ... ...
ফ্যন দাও বলে কারা কাঁদে রাস্তায়
ঘরে নেই ভাত, মাগো তুই কাছে আয় (লাল শপথের রাখী)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার মতোই অবধারিত ভবিষ্যতের চিন্তা করে মায়ের অসহায়তা ফুটে ওঠে সমর সেনের এই কবিতায়। তবু মনে কোনো একটু আশা, হয়তো এই দুঃসময় কখনো শেষ হয়ে যাবে—

চকিত বিদ্যুতে সেকি ভাবে,
তার অসহায়, দগ্ধগৃহ, দুগ্ধহীন শিশু
স্খলিত পায়ে দুর্ভিক্ষ পার হয়ে যাবে দেশান্তরী দিন। (শহুরে)

কলিকাতার রাস্তায় ভাতের খোঁজে আসা এই সব মানুষেরা অন্নাভাবে মরে পড়ে আছে এখানে সেখানে। অনাহারে অবহেলায় তিলে তিলে শুকিয়ে যারা মারা গেছে, সেই সব মৃতদেহ, কবির কলমে যেন হয়ে ওঠে জয়নুল আবেদীনের সেই দুর্ভিক্ষের চিত্রকল্প—

পেটেপিঠে এক হয়ে মেয়েটা ফুটপাথে মরে আছে
কেবল তাকিয়ে ওর জ্যান্ত চোখ দুটো।
হাত পা কাঠি কাঠি
চামড়া ফুঁড়ে উঠতে চাইছে পাঁজরগুলো
ভনভনিয়ে উঠছে মাছি উড়ছে হাঁ-করা মুখটায় ... ...
শিরীষ গাছের নিচে নিবানো উনুনে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ভাতের হাঁড়িটা
(শিরীষ গাছের নিচে/মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

সহৃদয় কেউ কেউ লঙ্গর খানা খুলে সাধ্যমতো হয়তো কিছুলোকের অন্নের জোগান দিয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের পক্ষে তা যথেষ্ট নয় বলে হতাশার ভাব কাটেনি ক্ষুধার্ত নরনারীর—

লঙ্গর খানার অন্ন খেয়ে...
ফুটপাত থেকে দূর নিরুত্তর ফুটপাতে গিয়ে
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমাতে বা মরে যেতে জানে
(তিমির হননের গান/ জীবনানন্দ)

১৩৫০ এর মন্বন্তর জীবনানন্দ, বিষ্ণু দের মতো সমকালীন অমিয় চক্রবর্তীকেও সমানভাবে কবি হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন আধুনিক সভ্যতার উল্টো পিঠ। মনুষ্যত্বের এই অবমাননায় বেদনা ভরা চিত্তে কবি লিখলেন—

রাতের কান্না দিনের কান্না ঘুরে ঘুরে ওঠে
অন্ন দাও
মূর্ছা চোখের অন্ন দাও
বোবা বুক বলে অন্ন দাও
কোথাও পাথর ভাঙ্গে না, ঝরে না অন্ন জল
কঠিন শহরে অন্ন নেই। (অন্ন দাও)

এভাবেই বাংলার গ্রামের পরে গ্রাম খালি হয়ে যাবে, কোন সমূহ সমাধান নেই। মানুষের লালসার শেষ নেই, 'মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর/যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল' ওঠে। তাই—

বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় নিস্তেল।...
কোথাও মানুষ নেই; বাংলার লক্ষ গ্রাম রাত্রি একদিন

আলপনার, পটের ছবির মতো সুহাস্যা পটলচেরা চোখের মানুষী
হতে পেরেছিল প্রায় ; নিভে গেছে সব।

এর কারণ খুঁজতে গিয়ে কবি দেখতে পেলেন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রোদে জলে পুড়ে যারা ফসল ফলায়, ফসলের মালিক তারা নয়, সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ বাংলার জমিদার হলেন শোষণ ও লোভের প্রতীক। তারাইতো কেনে নেয় দরিদ্রের মুখের খাবার 'সোনার দিগন্ত ধান লুণ্ঠিত হয় গ্রামের কিনারায়; (সন্দীপ)। কলিকাতায় বসে এরা স্ফূর্তি করেন, বাগানবাড়ীতে ইয়ার-দোস্তের সাথে মদ খান, বাইজী নাচান, প্রজার দূরবস্থার খোঁজ এরা রাখেন না। এরা ভণ্ড ধর্মপ্রাণ, লোক দেখানো পরোপকার চর্চা এদের ব্যসন, 'কালীঘাটে ধর্মপ্রাণ, পোষাক বদলিয়ে রেসে নামে। এই শোষক জমিদার গ্রামে থাকে না। কিন্তু তাদের ভূত রাতের অন্ধকারের মতোই সন্ত্রাস জাগায়—

ছায়া জমিদারের কায়া
তেতালায় বসে আছে কোথাও
ভয় পেয়ে ওঠে কাকেরাও। (কালের ভূত)

মন্বন্তরের কালেই যে এই সঙ্কট তা শুধু নয়, এখানেই রয়েছে আলোর নিচে অন্ধকারের মতোই ব্যসন-দৌলতের পাশাপাশি সীমাহীন অভাব ও দারিদ্র। দারিদ্রের নিদারুণ নিষ্পেষণে বাধ্য হয়ে অসহায় পিতা কন্যাকে ফিরি করে ময়দানের পাতলা অন্ধকারে—

মেয়েকে বসিয়ে ফাঁকা মাঠে
বাপ দূরে দাঁতে ঘাস কাটে
দিন রাত বছর বছর
তবে না উনুনে হাঁড়ি চড়ে। (নারীমেধ/অমিতাভ দাশগুপ্ত)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হিরোশিমার নারকীয় নরসংহার মানবসভ্যতার কলঙ্কময় অন্ধকারতম দিক। এর অবর্ণনীয় ধ্বংসলীলা প্রথমাবধি বাঙালী কবিদের মথিত করেছিল অবরুদ্ধ আবেগে। হিরোশিমা নামটি তখন ক্ষমতার মদগর্বীদের হাতে ধ্বংসের প্রতীক। আগস্টের সেই দিনটি একালের কবিকেও তা ভরিয়ে চলে—

ছায়ার মাঝে আর্তনাদে, মৃত্যু আসে অতর্কিত
মেঘের বুকে ঘূর্ণি ওঠে
ঘূর্ণি ওঠে মাটির ধ্বসে
রক্তমাখা গাসের বুকে ঘুর্ণি ওঠে
হঠাৎ সেদিন। (হিরোশিমা/ চিন্ময় গুহঠাকুরা)

এই শেষপংক্তির 'হঠাৎ সেদিন' শব্দ দুটিই নির্দেশ করে কবির দূরতম অবস্থান।

হিরোশিমার প্রশান্ত আকাশে যেমন এক সকালে হঠাৎ করে নেমে এসেছিল প্রলয়, প্রায় একইভাবে যেন তারই প্রতিধ্বনি করে অতি সম্প্রতি বিন-লাদেনের প্রলয়-রথ বৈভবের প্রতীক ট্রেড সেন্টারকে নিমেষে গুড়িয়ে দিল। ১১/৯ সেই অর্থে আজ ধ্বংসের প্রতীক চিহ্ন। এই সত্য-স্বপ্নও বাঙালী কবিদের কলমে মূর্ত হয়েছে ধ্বংসের বিভীষিকারূপে—

অনন্ত শব্দের বিপন্নতায় ভেসে যায় ইমারতের বস্তুপুঞ্জ, আর মানুষের আর্তনাদ
ফুলঝুরি কাঁচের জানালায়, ইটের বালুকণার, আলুমিনিয়াম চ্যানেলের
উত্তাল তুবড়ি, তুখড় বারুদ গন্ধ, গ্যাসোলিন...
শব্দেরা দিশাহারা—

কিন্তু এই বিপন্নতার মধ্যেও সচেতন কবি ভোলেন নি প্রবলপ্রতাপশালী ক্ষমতাদর্পী দেশটির কাছে সেই প্রশ্ন রাখতে, 'রাজার ভাঁড়ারে কে তবে দিল হানা' (কবিতা এগারোই সেপ্টেম্বর দু'হাজার এক/ সমর্পণ মুখোপাধ্যায়)।

দেশের স্বাধীনতা তখনও আসেনি, কিন্তু সেই দশকের অর্ধেক জুড়ে বিস্তীর্ণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের ইতস্তত বিন্যস্ত স্মৃতিচিহ্ন, অন্যদিকে স্বদেশে স্বাধীনতাকামী জনতার উপর ঔপনিবেশিক পুলিশের নৈমিত্তিক লাঠি-গুলি-হত্যার জমাট অন্ধকারে চাপচাপ রক্ত, যুবছাত্র আন্দোলনের উপর পুলিশের অত্যাচার, দেশের নানাস্থানে সংকীর্ণ রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে ভ্রাতৃহত্যায় প্ররোচিত বিপথগামী মানুষ উল্লাসে ফেটে পড়েছে, অনাহার-অত্যাচার-হতাশা- ক্ষোভে দীর্ণ ক্লেদাক্ত জীবনযাপন, মানুষের রক্তমাখা বীভৎস মুখে শুধু জিঘাংসার প্রতিচ্ছায়া। এই রাজনৈতিক বিন্যাস সমাজ থেকেই উঠে এসে সেকালের কবিদের কবিতার বাকবিন্যাস। 'চল্লিশের দিনগুলি' কবিতায় সেই অস্থির সময়ের এক কবি নিজের অভিজ্ঞতার নিরিখে যেন তারই সংবাদভাষ্য দেন—

কি দেখিনি, আমি এখানে?
সাফল্য, হতাশা, দারিদ্র্য, বোমা, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা
চল্লিশের সেই স্বপ্নে আর দুঃস্বপ্নে ভরা দিনগুলিতে
সবই আমি দেখেছি।

এই কবি দুচোখ ভরে যা দেখেছেন, তা মোটেই হৃদয়-নন্দন, দৃষ্টি শোভন কিছু দৃশ্যাবলী নয়—

দেখেছি ছাত্র মিছিলের উপর দিয়ে ছুটছে
লাল বাজারের
মাউন্টেড পুলিশের ঘোড়া। দেখেছি
ধর্মতলা স্ট্রিটের ট্রামলাইনের উপরে ছড়িছে রয়েছে
চাপচাপ রক্ত,
কেমেস্ট্রি প্রাকটিক্যালের খাতা, ভাঙ্গা চশমা আর
ছেঁড়া চম্পল।

সময় স্থির ছিল বলে কবি মঙ্গলাচরণের দর্শনেও কোন অন্যথা নেই। তিনিও দেখেছেন

দেখেছি কেমন করে পাগলা কুত্তা হেলমেট মাথায়
লাঠিগুলি গ্যাসে দাঁতে-নখে
রক্তবমনে উদগারে
বিষ্ঠায় নোংরায়
জীবনটা ক্লেদাক্ত করল। (শান্তি নেই)

এর অব্যবহিত পরেই বিধাতার অভিশাপের মত নেমে এল সরকারী ব্যবস্থাপনায় সমগ্র কলিকাতা জুড়ে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা। লীগ সরকার নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করতে দ্বিজাতিতত্ত্বের ফর্মুলায় অস্থিরতা সৃষ্টি করে প্রমাণ করে দিল যে সাম্প্রদায়িকতার শিকড় এখানে গভীর ভাবে প্রোথিত। অচিরাৎ এই হিংস্রতা ছড়িয়ে পড়ল বিহারে, নোয়াখালিতে। কিন্তু এই মধ্যযুগীয় বর্বর দাঙ্গায় যারা মারা যায়, ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তারা নিচুতলার অতি ছাপোষা নিরীহ লোক— হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজের দরিদ্র নিপীড়িত জনতার অংশ। আমাদেরই সেই সব অতি সাধারণ ভাই বোন, জীবনের কোন মহৎ উদ্দেশ্য যাদের ছিল না, তারাই মানুষের এই অবিমৃশ্যকারিতার শিকার হল।

যদি ডাকি রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হ'য়ে
ব'লে যাবে কাছে এসে, 'ইয়াসিন আমি,
হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ—
আর তুমি?'
আমার বুকের পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে
চোখ তুলে সুধাবে সে—রক্তনদী উদ্বেলিত
হয়ে বলে যাবে, 'গগন, বিপিন, শশী পাথুরেঘাটার;
মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফ স্ট্রীটের এন্টালীর—
কোথাকার কে বা জানে জীবনের ইতর শ্রেণীর
মানুষ তো এরা সব; ছেঁড়া জুতো পায়ে
বাজারের পোকাকাটা জিনিসের কেনাকাটা করে; (১৯৪৬-৪৭)

সমাজের এইসব সাধারণ শ্রেণীর উপেক্ষিত জীবনগুলোও এই ধরণের পাশবিক হিংসার বলি হয়। আমরাই আপনার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য হত্যা করি, 'দেখেছি আমার হাতে নিহত/ভাইবোন বন্ধু পড়ে আছে,' এরও কারণ নির্দেশ করেছেন জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায়, তিনি উপলব্ধি করেছেন, 'পৃথিবীর গভীরতর অসুখ এখন।'

অন্যদিকে হিন্দু মুসলমানের সেই দাঙ্গার সমাধান সূত্র নির্দেশ করতে বিষ্ণু দে আশ্রয় নিতে চেয়েছেন বিপ্লবী পন্থার। কিন্তু প্রশ্ন হল, সমাজবিপ্লবীরা কি স্বদেশে দিতে পেরেছে কোন স্থায়ী সুস্থ সমাধান? তারা তো নিজেদের সমস্যারই কোন সুষ্ঠু সমাধান করতে পারেন নি। ট্রটস্কিকে সোভিয়েত দেশ ত্যাগ করে মেক্সিকোয় চলে যেতে হল—

এবং উদ্বাস্তু ট্রটস্কি ইতিমধ্যে দেশ দেশান্তরে
ঘুরে মরেছিল, পুরাকালীন শহরে
গলঘন্ট কুষ্ঠরোগী, যত দ্বার সব বন্ধ দেখে,
যেন নির্জনে যেত ভিক্ষা ব্যতিরেকে। (সংবর্ত)

প্রত্যেকেই নিজ নিজ যুক্তি বুদ্ধি অনুসারে সাম্প্রদায়িক সমস্যার ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। কিন্তু ঘটনার বীজ যে কর্কট রোগের মত ভারতীয় মানসের অনেক গভীরে শিকড় ছড়িয়েছিল, তা সেকালের অনেকেই বুঝতে চান নি। তাই অহিংসার প্রতিমূর্তি গান্ধীজির সাথে ছেচল্লিশের দাঙ্গা উপদ্রুত কলিকাতা ও নোয়াখালী পরিক্রমা অভিজ্ঞতা দিয়ে অমিয় চক্রবর্তী বুঝে নিয়েছিলেন, দেশব্যাপী দাঙ্গার কারণ হল অশিক্ষাজনিত মূঢ়তা, তা থেকে মুক্তির কোন সহজ সমাধান নেই। উত্তরণ তো দূর স্বপ্ন। সংঘবদ্ধ অহিংস প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলে কিছু বা সাময়িক ফল পাওয়া যেতে পারে। গান্ধীজির সান্ধিধ্যে থেকে কবির মধ্যেও আশা জেগেছে সংঘবদ্ধ অহিংস প্রতিরোধ দিয়েই এই অমানবিকতা দমন করতে হবে। তিনি তাই শপথ নেন—

পাপের বদলে পাপী হয়ে, হত্যার বদলে হত্যা-শোক

মাথা নিচু করব না কোটি লোক। (সত্যাগ্রহ)

প্রশ্ন জাগে, তাহলে কি এই নির্বোধ ধ্বংসনামা চলতেই থাকবে? কোন দিনই শেষ হবে না? কেউ একজন দেবদূতের মতো এগিয়ে আসবে না শান্তির ললিত বাণী বহন করে? রাজনৈতিক নেতাদের উপর কোন আস্থা রাখতে পারেন না কবি। এতোদিনে তাদের চরিত্রের স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে গেছে জনতার চোখে। সরিষার মধ্যেই ভূত সেখানে। তাদের সম্পর্কে আপন স্বভাবে জীবনানন্দ লিখেছিলেন, 'উচ্ছৃঙ্খল প্রবাহের মত যারা তাহাদের দিশা/স্থির করে কর্ণধার? ...ভূতকে নিরস্ত করে প্রশান্ত সরিষা' (পরিচায়ক)। বুদ্ধদেব বসু কিন্তু আরও অনেক বেশী কঠোর শব্দ প্রয়োগ করেন এই সব জননায়কদের সম্পর্কে। তাঁর মতে এইসব নেতারা হলেন 'মূঢ়, ইতর, ধূর্ত, লোলুপ, স্বার্থপর'। সুতরাং জনতাই হবে ধ্বংসযজ্ঞের প্রথম আহুতি। যূপকাষ্ঠে বলি পশুর মতো 'আর্তনাদ ছাড়া আজ নৈবেদ্যের যোগ্য কিছু নাই।'

এতকাল বিশ্ববন্দিত সেই নেতৃত্বের আজ কি হাল?

অন্তর্হিত আজ অন্তর্যামী
রুষের রহস্যে লুপ্ত লেনিনের মমি
হাতুড়িনিষ্পিষ্ট ট্রটস্কি, হিটলারের সুহৃদ স্টালিন,
মৃত স্পেন, ম্রিয়মান চীন,
কবন্ধ ফরাসীদেশ

এই ধূর্ত, লোলুপ, স্বার্থপর নেতারাই রাজা হবেন, মন্ত্রী হবেন এবং হচ্ছেন। তবে তাঁরা লাল জামা নীল জামা গায়ে দিক না কেন, আসলে তাঁরা সব এক, তাঁদের অন্তরে অধিষ্ঠিত লোভের দেবতারা। 'যোদো কিংবা মোদো/সব ব্যাটা সরকারই কিন্তু আসলে এক, এসেছে/ রবারের ছাপ মুখে নিয়ে' (কারখানায় কাজ/ সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)। এই সব কবিদের সৌভাগ্য, তারা এই শতাব্দীর শেষের গণনায়কদের দেখে যন নি। সার, চিনি, জমি, টেলিফোন, গোখাদ্যের পঙ্কিল আবর্তে ঘুরপাক খেয়েও শ্বেত বস্ত্র শোভিত হয়ে আজকের বুদ্ধিজীবীদের নন্দিত প্রশস্তি রচনার ও প্রাতঃবন্দনার পাত্র।

বিষয়কে আলাদা ভাবে না ভাবলেও বিষ্ণু দের কাব্য প্রকরণ এমনই যে সেখানে স্পষ্ট উচ্চারণ পরিহার করে ঐতিহাসিক পৌরাণিক কিংবা লোক-ঐতিহ্যের অনুষঙ্গে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে তাকে একটি ভিন্ন মাত্রা দিয়ে সাময়িক থেকে চিরকালের মলাটে মুড়ে দেন। তা সে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গার প্রসঙ্গই হোক, পুঁজিপতি ও শ্রমিকের সংঘর্ষ, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে রচিত 'সন্দীপের চর', 'চৈতে বৈশাখে' '১৪ই আগস্ট', 'প্রচ্ছন্ন স্বদেশ', 'অম্বিষ্ট', 'হাসানাবাদেই', 'মৌভোগ', 'পারুলের ছড়া' প্রভৃতি কবিতাতেই কবি এই স্বকীয়তার নজির রেখেছেন—

দিকে দিকে বক্রগতি উদ্ধত কৌরব
চলে সূর্য বিতাড়িত অন্ধকার ঘরে।' (হাইকোর্ট পাড়ায়)

বক্রগতি কৌরবেরা ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। প্রায় একই ভাবে কবি বলেন, 'সিনেমা, দোকান কাফে অলিগলি মোড়ে/ লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ পাণ্ডুরোগী ঘোরে' (চৌরাঙ্গি)। এভাবে তো বেঁচে থাকা যায় না। চারিদিকে 'ঘৃণার সমুদ্র নীল, নীল জল আকণ্ঠ ঘৃণার'। প্রদীপের সলতের মতো নিজেকে দগ্ধ করা ভাল কি নীলকণ্ঠের মতো এই হলাহল ধারণ করে অমৃত বিতরণ করা শ্রেয়? আশাবাদী কবি তাই পল এলুয়ারের মতোই এই রুদ্ধশ্বাস ঘৃণা থেকে উত্তরণ চেয়েছেন।

এরই মধ্যে স্বাধীনতা এল। কিন্তু স্বাধীনতা কোন আলাদীনের যাদুদণ্ড নয় যে সে শতাব্দীর পুঞ্জীভূত সহস্র সমস্যার সহজ সমাধান এনে দেবে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কার জাতিদাঙ্গার অভিজ্ঞতা একবার জনচিত্ত মথিত করেছে। স্বাধীনতার পরেও তা শেষ হবার নয়। দেশভাগজনিত কারণ দেশের উভয় সীমান্তেই এবার উদ্বাস্তুর ভীড়। অবর্ণনীয় তাদের দুর্দশা।

অন্ধ আর্তনাদে বিদ্রুপের সহস্র চাবুক...
মাগো এই দেশ এরা নাকি এরা নাকি মানুষের মুখ
অসহায় শেয়ালদার উদ্বাস্তুর অন্তিম কাহিনী
এই দেশে, এ যে মৃত্যু, তিলে তিলে মৃত্যুর অসুখ।
(সার্থক জনম/অসীম রায়)

লক্ষ লক্ষ তাজা প্রাণের রক্তের বিনিময়ে এই স্বাধীনতাই কি আমরা চেয়েছিলাম, যেখানে নাগরিকের স্বদেশ হারিয়ে যায়। পঞ্চাশ বছরের বেশী সময় ধরে কত চক্রান্ত, অত্যাচার সহ্য করে কি লাভ হল অবশেষে?—

এই স্বাধীনতা? অনেক দিনের কামনা আমার?
হাজার মৃত্যু ভস্মশ্মশান গঙ্গা নামে
লাখে লাখে লোক কাতারে কাতারে এ কলকাতায়
উদ্বেল ঢেউয়ে ভাসে, খুঁজি তবু আপন গ্রামে। (শীতলাই/মণীন্দ্র রায়)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও প্রায় একই উচ্চারণে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর স্বাধীনতাপরবর্তী হতাশা, 'স্বাধীনতা! হায় স্বাধীনতা। অন্নহীন, ভাষাহীন, নিরানন্দ/খণ্ডিত স্বদেশ।' (অন্নহীন ভাষাহীন হলে)। অথচ এই অনিকেত অবস্থার ঢেউ যাদের লাগেনি, কলিকাতায় তারা কি নিশ্চিন্ত প্রাত্যহিকতায় নির্লিপ্তভাবে উপরের জানালা থেকে ছিন্নমূল মানুষের দূরবস্থার এই ছবি দেখে বৈকালিক অবকাশ যাপন করে, 'বৌয়েরা দোতলা থেকে চুলের বিনুনী হাতে নিয়ে/ দেখে পথে বাস্তুহারা মায়ের মিছিল'।

সাম্প্রদায়িকতা, দুর্ভিক্ষ, নৈরাজ্য, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন কখনো যবনিকা টানে না। 'চরিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়-অলীক

প্রয়াণ/মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর;/ যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল;' (এই সব দিন রাত্রি)। কবি ভাবেন, পরবর্তী প্রজন্মের স্বাধীন ভারতের শিশুরা হয়তো বা সৌভাগ্যবান, তাদের এই দেশভাগের নৃশংসতা দেখতে হবে না। তাদের—

জ্বলতে হয়নি ছেচল্লিশের যন্ত্রণায়, মার এই মহামারীর
ভীষণ রোগ রক্ত নিয়ে
দেশ যখন সন্তানের হিংসা, দ্বেষ, মায়ের দেহের মাংস নিয়ে
কাড়াকাড়ি নরক।
দেখতে হয়নি সাতচল্লিশে কার্জনের ভূতের নাচ
লুম্বিনার চেয়ে ইতর।
ভারত জুড়ে দেশভাগের উত্তেজনা। (মৃত্যুর পর, কুড়ি বছর/ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

পঞ্চাশের দশক ধরে আহত ভারতের ক্ষত কিছুটা প্রশমিত হতে না হতেই চীন ভারতের যুদ্ধ, কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভাজন—পাকিস্তান যুদ্ধ, কিউবা ও ভিয়েনামের ঘটনাবলী, নকশালবাড়ী প্রারম্ভ— এই নিয়ে উত্তাল হয়ে উঠেছিল সেই ষাটের দশক। দিশাহারা সাধারণ বাঙালীচিত্তে দেশভাগের ক্ষতচিহ্ন একটু শুকিয়ে এলেও সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে দুই যুযুধান গোষ্ঠীর মেরুকরণ প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়ে গেছে ততদিনে, অত্যাচার-নিপীড়ন, শোষণ বঞ্চনায় হাতিয়ার শানিয়ে প্রগতিপন্থী একদল তথাকথিত বুর্জোয়াব্যবস্থার অচলায়তন লক্ষ্য করে ঘৃণা উদগীরণ করতে লাগলেন। স্বভাবতই তরুণ সমাজ এর প্রতি বেশী করে আকৃষ্ট হলেন। তেভাগা ও বামপন্থী খাদ্য আন্দোলনের প্রভাব এই সময়ে কবিদের লেখনীকে আর্শ্চরকম প্রভাবিত করেছিল। সবুজ বিপ্লব তখনো আসেনি। দুমুঠো ভাতের জন্য তখনো থাকতে হচ্ছে পশ্চিম দুনিয়ার দিকে। যা আছে, তাও বন্টিত হচ্ছে না সুষ্ঠুভাবে। অন্নহীন মানুষের বোবা কান্নায় আহত কবি লিখলেন—

আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে
কারা যেন আজো ভাত রাঁধে
ভাত বাড়ে, ভাত খায়।
আর আমরা সারারাত জেগে থাকি
আশ্চর্য ভাতের গন্ধে
প্রার্থনায়, সারারাত। (আশ্চর্য ভাতের গন্ধ/বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

সবুজ বিপ্লবের আগে দেশ জুড়ে অন্নাভাব, অন্নহীনের হাহাকার, অভাব, দারিদ্র্য শিল্প-সাহিত্য-চলচ্চিত্রকারদের অতি আহ্লাদের বিষয় ছিল। শ্রেণীসংগ্রামের প্রবক্তারাও এই সুযোগকে কাজে লাগাতে ভোলেন নি। সুকান্তের পরবর্তী কবি-সাহিত্যিকেরাও বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই প্রসঙ্গ তাদের কলমে এনেছেন। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার 'অন্নদেবতা', 'রুটি অনেক দূর', 'রুটির জন্য' শীর্ষক একাধিক কবিতায় এই সর্বগ্রাসী ক্ষুধাপ্রসঙ্গ এনেছেন—

রুটি দাও রুটি দাও।
বদলে বন্ধু যা ইচ্ছা নিয়ে যাও
সমরখন্দ বা বোখারা তুচ্ছ কথা,
হেসে দিতে পারি স্বদেশের স্বাধীনতা (রুটি দাও)

সত্তরের দশক, আগুনের দশক। সমাজব্যবস্থা আমূল পাল্টে দিতে সময়কে অগ্রাহ্য করে এই বাংলার তরুণসমাজ দীপশিখার প্রতি পতঙ্গের আত্মাহুতির মতো একটি অপরিকল্পিত লক্ষ্যহীন মৃত্যুগহ্বরের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারা বদলে দিতে চেয়েছিল ইতিহাস। শ্রেণীসংগ্রামের নামে একদিকে বলিপ্রদত্ত অসহায় মানুষেরা যূপকাষ্ঠের নিকটে আনীত, অন্যদিকে দমনকারী পুলিশী নির্যাতন ও শাসকদলের নিষ্ঠুর হাতে নিত্যদিন তাজা তরুণদের খুন হয়ে যাওয়ার বিষাদের ছাপ ধরা পড়েছে মণিভূষণ ভট্টাচার্যের কবিতায়—

উনুন জ্বলেনি আর, বেড়ার ধারেই সেই ডানপিটের তেজী রক্তধারা
গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা।
কিংবা চুলে যে অরণ্য ছিল
ভুলে গেছি, এখন শুধু মনে পড়ে
হাজার হাজার ছেলের লাস ঠান্ডা ঘরে (গান্ধীনগরে একরাত্রি)

নকশাল আন্দোলনের শুরুতেই তাদের শ্রেণীশত্রু খতম অভিযানের ফলশ্রুতিতে দেখা গেল, তাদের অবিমৃষ্যকারিতায় মানুষ মরে পড়ে আছে শত্রুর হাতে, ''একটি শান্ত মৃতদেহ/ তার বুকে নরহস্ত চালিত জখমের দাগ/ সেখানে এসে চুমু খাচ্ছে ঘাষের শিষ' (নিঃস্ব পথে পড়ে থাকা একটি শহীদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ)। যে লাল ঝান্ডা ছিল বামপন্থী আন্দোলনে মুক্তির নিশানা, প্রগতির প্রতীক, কিন্তু সত্তরের দশকে তাই শহীদের শব ঢাকতে ব্যবহৃত হচ্ছে। কবির কাছে এই দৃশ্য অত্যন্ত বেদনাবহ—

লাল ঝান্ডা আসছে
উউতে উড়তে পতপত করতে করতে নয়
কাৎ হয়ে, কাঁদতে কাঁদতে

নিঃসার সেই দেহ ঢাকবার জন্য। (লাল ঝান্ডা)

গত শতাব্দীর সাতের দশক চিহ্নিত হয়ে আছে রক্তের দশক, অনিশ্চয়তার দশক হিসাবে। অকারণ রক্তপাত, হত্যার উল্লাস, সন্দেহ আর অবিশ্বাস, যেন মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তিমূল নাড়িয়ে দিয়েছিল। অথচ কিছু প্রকাশ করা যাবে না, নিষেধ স্পষ্ট উচ্চারণে। তাহলে 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'র মতো শ্বশুর -গ্রামের আসা সেই ছাপোষা শ্রমিকটির কাছে পানের মোড়ক হয়ে আসা ইস্তাহার বিলির অভাবনীয় অপরাধে জবাবদিহি করতে হবে উন্মার্গগামী বেপথু জনতার আদালতে। শতাব্দীর শেষ পর্বে আবার সেই জরুরী অবস্থা—দমননীতি, অলিখিত সন্ত্রাস। স্বার্থান্বেষী নেতৃবর্গ দুই শিবিরে বিভক্ত। সেই রুদ্ধশ্বাস সময় কবি তো আর উটপাখী হয়ে বলিতে মুখ গুজে বসে থাকতে পারে না। কবিরা তাই প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস পুরাণের ভস্মাচ্ছাদনের নীরব প্রতিবাদ করে চলেছেন। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, 'চোখ রাঙালে না হয়/গ্যালিলিও লিখে দিতেন/ পৃথিবী ঘুরছে না/ পৃথিবী তবু ঘুরছে, ঘুরবেও/ যতই তারে চোখ রাঙাও না'।

এই অবাধ অস্থিরতায় নিজের উপরও আস্থা হারিয়ে ফেলেন কবি, অবিশ্বাসের পরিমণ্ডলে থেকে থেকে আত্মবিশ্বাস হারানো— 'আমাদের কারো মন এখন আর/বিকেলের ছায়া ডোবান জল নয়'। এই নিরাপদ নৈসর্গিক স্থিরচিত্রের উপমায় আপাতশান্ত কবিচিত্তের দোলাচল অনুভব করা যায়, বোঝা যায়, অন্তরে তার কি ভীষণ লাভারাশি উদগীরণের অপেক্ষা করছে। কিন্তু সময় সহায়ক নয় বলেই যাকে সবচেয়ে বেশী বিশ্বাস করা চলে, প্রয়োজনে সেই-ই হয়তো বিশ্বাসঘাতকতা করে বসবে কর্ণের রথের চাকার মতো– 'এখন সেখানে ভীষণ আগুন/মানুষ ও পশুর চিৎকার, রক্ত ভয়।' নতুন দিনের শুরু এখন আর কোন খুশির বার্তা বয়ে আনে না— দিন এখন ''ঘাড়ের মাংসের উপর/ বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ে' (কর্ণের রথ/ মৃগাঙ্ক রায়)।

এই শ্বাসরোধী অবহমণ্ডল থেকে কি মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায় কোন দিন? কবি মুক্তিকে দেখেন বনভোজনের চিত্রকল্পে। সবান্ধবে বনভোজনে যাবার আনন্দে শুধু মুক্ত পরিবেশই না, যেন নিজের হারানো কৈশোরকেও খুঁজে পাওয়া যায়। তবু সন্দেহ থেকে যায়, সেই মুক্তির আনন্দ সবাইকে নিয়ে উপভোগ করা যাবে কিনা। সংশয় থেকেই যায়, 'কাল যদি বেঁচে থাকি বনভোজনে যাব/ প্রিয়নাথ, তুমিও এসো, যদি বেঁচে থাকো/ তুমি অবশ্য এসো।' (বনভোজন) তবে সেপর্যন্ত সবাই বেঁচে থাকবে কিনা সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, ''সারা দেশটা বড় দুলছে,...বেসামাল নৌকার মতো...।' পশ্চিমবঙ্গে যেন উপর্যুপরি দুটি রাজনৈতিক ঝড়ে জীবন প্রায় অনিশ্চিত, অন্য দিকে ঠিক সেই সময়ে প্রতিবেশী বাংলাদেশে স্বাধীনতার যুদ্ধে জঙ্গী নিষ্পেষণে ত্রিশ লক্ষ লোক স্বভূমি থেকে ছিন্নমূল, উৎপাটিত। ভারতের কাছে তারা আশ্রয়প্রার্থী। আবার দেশমাতৃকার চরণে আহুতি দেবার জন্য তৈরী হাজার হাজার তরুণ। সেই এক ভীষণ উন্মাদনা। দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিচ্ছে বাংলার মায়ের সন্তানেরা, আত্মমর্যাদার লড়াইয়ে ''ধূ দূ পদ্মার চর ঝিরি জল/ চারটি তরুণ, পাশে চারটি রাইফেল/ জাহ্‌শাহীর শফিকুল পাবনার কাদের/ঠিক জেনেছিলাম/মুক্তিযুদ্ধ দুর্গা পুজো নয়/...তারা মৃত্যুঞ্জয়।'

(পদ্মার চর/অসীম রায়)।

পাঞ্জাবের খালিস্তানী জঙ্গী আন্দোলনের সাথে পশ্চিমবঙ্গের নকশাল আন্দোলনের পার্থক্য কেবল তত্ত্বগত ভাবেই না—নকশালরা বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চাইলেও তা কোন অবস্থাতেই বিদেশী মদতপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ছিল না। খালিস্তানী আন্দোলনের মত খুনের রাজনীতি এর প্রতিপাদ্য হলেও বিদেশে বসবাসকারী পৃষ্ঠপোষকদের অর্থানুকুল্যে ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সহায়তায় ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের লক্ষ্যে প্রাথমিক ধাপ থেকে অ-শিখ নাগরিকদের বিতাড়ন করার পন্থা হিসাবে খলিস্তানীরা পরিকল্পিতভাবে গণহত্যা, অগ্নিকান্ড, লুঠতরাজ, জাতীয় অস্থিরতা, ব্যাপক সন্ত্রাস চালিয়ে গিয়েছিল কয়েকটি বছর। পরিণামে সরকারী নির্মম নিষ্পেষণে হাজার হাজার তরুণের রক্তের অকাল বিনষ্টি। একজন প্রধান মন্ত্রীর প্রাণদান। বাঙালী কবির চোখে তারুণ্যের সেই অপচয় ধরা পড়েছে সম্পূর্ণ অন্য মাত্রায়—

আতপ্ত গমের শিষে
লেগেছে রক্তের ছিটে। ফাজিলকা থেকে
কান্নার ক্যাসেট তুমি এই জুনে পাঠালে, কুলদীপ
সন্ত্রাসের ধোঁয়া আর স্বর্ণমন্দিরের ফিকে স্মৃতি
নিয়ে ঐ ট্যাকসি এলো কলকাতার গুরুদোয়ারায়।

কুচকাওয়াজ/ অমিতাভ দাশগুপ্ত

কিন্তু এই ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্বে তো তৃতীয়পক্ষ অন্য কেউ মরে না। দুপক্ষেই আছে কৌরব পাণ্ডব ভাইয়েরা। আপন সহোদর হয়তো বা অন্য শিবিরে ভ্রাতৃঘাতী শস্ত্র শানাচ্ছে। রাত ভোর হলেই তাঁরা মারণযজ্ঞে পরস্পরের মুখোমুখী হবে। অপরদিকে সত্তরের দশকের নকশাল আন্দোলনেও ছিল সেই একই ভ্রাতৃনিধন যজ্ঞ—শ্রেণী শত্রুর নামে স্কুলশিক্ষক ও পুলিশের সাধারণ কনস্টেবল খতমের আয়োজন। মাতা কুন্তী ও গান্ধারীর সন্তানেরাই তো যুযুধান দুই পক্ষে। অবিশ্বাসের আবহাওয়ার সহোদরের রক্তেও রঞ্জিত হয়েছে কনিষ্ঠের হাত—

আমরা কেউ মানুষই নই—
কেউ কর্ণ
কেউ বা অর্জুন।...
একই নাড়ী ছেঁড়া দুই রক্তজবা। (কর্ণার্জুন)

কখনো পরস্পরের মুখোমুখী, কখনো বা রাতের অন্ধকারে চোরাগোপ্তা আক্রমনে এই আত্মজন বিদ্ধ হবার আনুমানিক

আয়োজনকে পৌরাণিক পটভূমিকায় দেখেছেন কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত।

ভারতীয় ভূখণ্ডে আঞ্চলিকতাবাদ প্রথম থেকেই কার্যকর ছিল মূল দেশটির বিশালায়তন ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্য। স্বাধীনতার পরবর্তী কালের নির্দিষ্ট কয়েকটি মাত্র রাজ্য ভাষা ভূগোলের ভিত্তিতে ভেঙ্গে ক্রমশঃ নতুন নতুন রাজ্য গড়ে উঠলে রাজ্যপালের সংখ্যাবৃদ্ধি পেয়ে বেকার সমস্যার কিছু সুরাহা হয় বটে, কিন্তু যারা আন্দোলন করে বিভাজন প্রক্রিয়ায় রক্তপাত ঘটিয়েছেন, তাদের অবস্থার ইতর বিশেষ হয়নি। কেবলমাত্র অংশ বিভাজন কোন মৌলিক ভাষা প্রীতি নয়, এক স্তরে তারা স্বদেশ ও স্বাধীনতার মতো নতুন রাষ্ট্র গড়ার দাবীও করে বসেন। উত্তর - পূর্বাঞ্চলের দাবীর মতো খালিস্তানী আন্দোলন, কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, প্রতিহিংসা পূরণের বড় সুযোগ করে দেয়। বিশুদ্ধ স্বাধীনতার দাবী না থাকলেও প্রথমে অসমে প্রফুল্ল মহান্ত ব্রিগেড ও তার অব্যবহিত পরে দার্জিলিং-এ সুভাষ ঘিসিং -এর পরিচালনায় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবীতে হঠাৎ বাঙালী খেদাও আন্দোলনে প্রাণ দিতে হল অসংখ্য নিরীহ মানুষের। পুরুষানুক্রমে একটি রাজ্যে বসবাস করার পরে আচমকা তারা অন্য খবর পেল; অনুভব করল— শিকড় নড়ে গেছে, ঐ দেশ আর তাদের নয়, যে ভূমিতে তারা এতদিন ফসল ফলিয়েছে, অঘ্রাণে নবান্নের উৎসবে মেতেছিল, পৌষে বাস্তুদেবীর পূজো করেছে, এখন থেকে সেখানে তারা অবাঞ্ছিত। এতদিন সেই ভূমিতে তারা ছিল পরবাসী। অথচ তাদের নেই কোন আপন স্বদেশ। ১৯৪৬, ১৯৪৭ এর পরে আরও একবার তারা উদ্বাস্তু। পশ্চিমবঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করলেও কেউ কেউ অনেকে আবার সেই ফেলে আসা বাংলাদেশেই ফিরে যেতে চাইছেন। ত্রিপুরা-মেঘালয়ের অনেক বাঙালী যেমন এখনও ভূমিপুত্রদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে প্রত্যাবর্তনই প্রকৃষ্ট মনে করেন।

কালপ্রবাহে এসব ঘটনার অনেকটাই এখন জনচিত্ত থেকে উধাও। কিন্তু ইলাসট্রেটেড উইকলির সেই বিখ্যাত ছবিটির জন্য নির্বিচার নেলীর শিশুহত্যার পাশবিক দৃশ্যটি সংবেদনশীল কোন মন থেকেই মুছে যাবার নয়। কবি লিখলেন... 'যে হাত ফসল তুলবে সেই হাত কেটে/ভাবো তুমি দিগ্বিজয় করো/...নিজের হাত-পা তুমি নিজে গুলে খাও।' (এক অবিমৃশ্যকারীকে/ সরোজলাল বন্দ্যোপাধায়)। লোককথার রাক্ষসের মতো নিজ অঙ্গচ্ছেদ করে বিমল আনন্দ পাওয়া যেতে পারে না। কর্তিতমুণ্ডে নিজরক্ত পানকারী দেবী চামুণ্ডার চিত্রকল্পে এই কবি অনুভব করেন, শত্রুচিহ্নিত করার এই তত্ত্বটাই আত্মহননের নামান্তর মাত্র।

চামুণ্ডা এই মাটি খায় নিজ রক্ত নিজে
ভাবে এতে ফসলের বৃদ্ধি হবে জোর
ভাবে তার ভাগ্য যাবে এমনি করে ফিরে
অথচ পিছনে শত্রু ষড়যন্ত্র আঁটে ঘনঘোর। (চামুন্ডা)

অসমবাসীর চিত্তে স্বর্ণসম্ভাবনা দেখিয়ে যারা ঐ পাশবিক কর্মে প্ররোচিত করেছিল, ইতিহাস তাদের ক্ষমা করেনি। কদিন যেতেই সেসব আন্দোলনকারীদের দাঁত-নখ বেড়িয়ে এল। দুর্নীতি, আত্মকলহ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, উন্নয়নের অর্থ আত্মসাৎ, ধর্ষণ সহ দুষ্ট ব্রণের মতো নানা অনুষঙ্গ-দোষ দেখা যেতে লাগল একদা বিপ্লবীদের মধ্যে। কবি এরও কারণ উপলব্ধি করতে পারেন। হিংসার দ্বারা কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না। কিন্তু সেই দাম্ভিক আন্দোলনকারী বুঝতে পারে না যে সে নিজের রক্ত নিজে পান করছে। বিপ্লবের সূর্য তার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে, সে চিনে উঠতে পারছে না সঠিক পন্থা, ''সে আলোকে দিগভ্রান্ত তুমি/নিজেরই গর্ত নিজে খোঁড়ো।' (এক অবিমৃশ্যকারীকে)। ফলতঃ একদিন যারা মাথায় করে তাদের ক্ষমতায় বসিয়েছিল, তারাই এবার তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিল।

কবিচিত্ত কেবল মাত্র দারিদ্র্য, গ্লানি হিংসাপূর্ণ বাইরের ঘটনাবলীর দ্বারাই আলোড়িত হয় না। প্রতিনিয়ত রক্তক্ষরণ ঘটতে থাকে তারই অন্তরে। অনুশোচনা অস্থিরতা দারিদ্র্য একাকীত্ব আত্মতৃপ্তির অনিকেত ভাবনায় আত্মিক সংকটে অধীর হন কবি। জীবনের এই সঙ্কটকালে ডস্টয়ভস্কির মতো অনেকেই আশ্রয় নেন ধর্মীয় বিশ্বাসের। কিন্তু সমগ্র বাংলা কাব্যে সম্ভবত চাঁদ সদাগরের মতো গভীর মানসিক সঙ্কটে আর কেউ পড়েননি। সমগ্র জীবন যিনি দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা ভিন্ন অন্য কিছু করেননি, অন্য কোন দেবতার মহিমা তাঁর কাছে বড় বলে মনে হয়নি, মনসার গূঢ় গভীর চক্রান্তে এবার পূজা দিতে হবে। তা শুধু শিবের অবমাননাই নয়, চাঁদবণিকের কাছে তা একান্তই পুরুষকারেরই পরাভব।

যেই হস্তে পূজি আমি দেব শূলপাণি।
সেই হস্তে কেমন পূজি চ্যাংমুড়ি কাণি।।

একালের নারীবাদী ধারণা নিয়ে তুমুল হৈহল্লা শুরু হবার বহুদিন আগেই চর্যার সাধক কোন কালে নারীর শরীরকে তুলনা করেছিলেন হরিনের সাথে, 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী।' মাংসের সুস্বাদ আর অসহায়তার সুভোগে লোভী শ্বাপদ ও শিকারীর লালসার বলি হয় চঞ্চল লাবণ্যে ভরপুর এই প্রাণী। এই চিত্রকল্পকে কাজে লাগিয়ে নারীনির্যাতনের চমৎকার গাথা তৈরি করেন একালের কবি কবিতা সিংহ—পুরুষের লালসার শিকার হতভাগিনীদের অত্যাচারের ব্যাখ্যা যেন এভাবেই দিতে চান এই কবি। নারী হবার অপরাধে নয়, বর্ণবৈষম্য ও সামাজিক অসাম্যের শিকার হয়ে পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর মেয়ে চুনী কোটালকে প্রাণ দিতে হল কি কারণে, তা আজও রহস্য থেকে গেল। কিন্তু কবি দেখেন, বিংশ শতাব্দী এসে গেলেও এই সমাজের 'শিকড়ে ছিল কাঙ্ক্ষিত দূষণ'। সাধারণ মানুষ কিছুটা নিস্পৃহ হয়ে আছে 'এখন ধর্ম নেই, ধর্মের ইশারা আছে রাজনীতি আছে/ক্ষুধা নিয়ে তৃষ্ণা নিয়ে দুপুরের ফেরিঅলা/...এই নিস্তব্ধতায়/প্রকাশ্য ল্যাম্পপোস্টে মানুষের মৃতদেহ/ ঝুলে থাকতে দেখে।" সেই মেয়ে কিন্তু কবির অনুভূতিকে তীব্রভাবে নাড়িয়ে দিয়ে গেল—

বাঙালীর মেধায় মননে নুড়ো জ্বেলে

জ্যোৎস্নায় ভেসে ওঠে
কখনো কখনো চুনি কোটালের শব।

(চুনি : কুমায়ুনের কস্তুরী মৃগেরা/দীপেন রায়)

যেন সেই একইভাবে আর এক কবি জয় গোস্বামী নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যাটির ব্যর্থ প্রেমের পরিণতিতর কথা ভেবে আশঙ্কিত হন, 'আজ জুটেছে কাল কি হবে/ কালের ঘরে শনি/ আমি এখন এই পাড়ার সেলাই দিদিমণি/ তবু আগুন, বেণীমাধব-আগুন জ্বলে কই/ কেমন হবে আমিও যদি নষ্ট মেয়ে হই।'' কিংবা সেই রুবি রায় নামের মেয়েটি যে সমস্ত ক্লেদাক্ত গ্লানির বিসর্জন দিলেন বোসপুকুরের জলে, ভোপালের বৃহন্নলা কমলা মৌসি খবর হয়েছিল অন্য কারণে। সংবিধানের অধিকারে জনপ্রতিনিধি হবার সুযোগ পেলেও আইনের অসংজ্ঞাত লিঙ্গরূপের জন্য তার প্রতিনিধিত্ব হরণ করা যায়। এর অনেককাল আগেই এদের সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন এক কবি—

অশীতোষ্ণভাবী মানুষ...
ওদের দেবে কি চিহ্ন মেয়েমানুষের, পুরুষের?
অনির্দিষ্টযোনি ওই কজন
বেঁচে থাক ডাইনিতুল্য প্রত্ন কলকাতায়। (উদ্ধৃতি : বিজয়া মুখোপাধ্যায়)

মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবীর পরিবারে মাসের প্রথম রবিবার মাংস কেনা হয়, মাসে একদিনই। কড়াইয়ে ফোটার মতোই উৎসব টগবগ করে সারা বাড়ী। বাড়ী আজ শান্তিনিকেতন হয়ে উঠলেও কম বাজেটের কারণে গৃহকর্ত্রীর ভাগের বাটিতে শুধু ঝোল বই আর কিছু থাকে না। জননীর এই নিয়ত বঞ্চনায় আহত হয় কবি হৃদয়। ''বিলুর বরাদ্দ চার চুকরো/ ওর পরশু/ফাইনাল/নীলু তিন/মেটুলীর পীস মা-মনির।'' মাংসের বাকীটুকু পেলেন কর্তা, ''আলু আর একটুকরো চর্বির সুবাদে/ বাপের দুচোখ জুড়ে মহাপ্রসাদের পূণ্য/ আলুহীন মাংসহীন একবাটি ঝোল খেয়ে উঠে যান গণেশজননী।'৪ (আজ মাংস/অমিতাভ দাশগুপ্ত)।

অনটন আত্মগ্লানি আর অনুশোচনায় অস্থির মধুসূদন দত্ত প্রবাসে অবস্থানকালে এমন এক মানসিক অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন যে ''দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী' বিদ্যাসাগরের আনুকূল্য অমৃতফল পেয়ে দিনাতিপাত করতে বাধ্য হয়েছিল। আপনার দেশকে, ভাষাকেই তখন তাঁর অমূল্য বলে প্রতীত হয়েছিল। ফিরে ফিরে তার কাছেই প্রার্থনা করেছিলেন আমরত্বের আশীর্বাদ—প্রবাসে দৈবের বশে/জীব তারা যদি খসে/ এ দেহ আকাশ হতে, নাহি খেদ তাতে।/ ...সেই ধন্য নরকূলে/লোকে যারে নাহি ভুলে/মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজনে;/ কিন্তু কোন গুণ আছে/ যাচিব তব কাছে,/ হেন অমরতা আমি, কহ গো, শ্যামা জন্মদে।'৪

যৌবনের অহমিকায় অতি আত্মবিশ্বাসী কবি একদা যে মাতৃভাষাকে অবহেলা করে ইংরেজি ভাষাকেই প্রকাশের মাধ্যম করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরে উপলব্ধি করলেন, এই বঙ্গের ভাণ্ডারেই মণিরত্নের অভাব নেই। দ্বন্দ্বে দীর্ণ করি এবার সেই ভাষার কাছেই স্বীকারোক্তি করলেন—

অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মন,
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি;
কেলিনু শৈবালে ভুলি কমল কানন।

বলা বাহুল্য, এই স্বীকারোক্তিতে কবির মহানুভবতাই প্রকাশ পেয়েছে। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় এইভবে যে আত্মদ্বন্দ্বের শিল্পসম্মত প্রকাশ ঘটেছে তা অন্যত্র বিরল। শব্দের ধারাবাহিক ব্যাসকূটে তিনিই ক্রমশ লিখতে পারেন, ''এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে, —জানি না সে এইখানে শুয়ে আছে কিনা।' বা ''যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা' কিংবা, ''মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়।' পুনরুক্তি হলেও বলা যায়, জীবনানন্দের কবিতার জগতই আলাদা, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র, যেমন ''সকল লোকের মাঝে ব'সে/ আমার নিজের মূদ্রাদোষে/ আমি একা হতেছি আলাদা।' সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিষয়টি অনুভব করেন সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রায়। মনে পড়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সেই কিংবদন্তীতুল্য পংক্তি কটি— 'ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে?/ মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া।/ অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে?/ কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া।'

বাংলা কবিরা ধারাবাহিকভাবে দায়িত্ব সচেতন— কি প্রেমে, কি বিদ্রোহে।'